★ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি--মুদ্রাস্ফীতি ★

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] শুক্রবার, ১৫ই আশ্বিন ১৩৫৫, ১লা অক্টোবর ১৯৪৮ [মূল্য—দুই আনা

ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানে বেসরকারী অর্থনীতিবিদ হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, সরকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মায় সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণকে লইয়া যে রাজকীয় ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে বিখ্যাত, অতিবিখ্যাত আবার নামহীন গোত্রহীন পণ্ডিত প্রবরেরা গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছেন; নয়া দিল্লীর সরকারী বৈঠক হইতে কলিকাতায় জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রী খোঁজ পরিষদের গ্রাণ্ড হোটেলের ভোজসভায় পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা ও কথার ফোয়ারা ছুটিতেছে। ভারতবর্ষে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে নেতারা এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন—প্রতিকার তাঁহারা নাকি না করিয়া ছাড়িবেন না। বক্তৃতা, বিবৃতি আর উপদেশের ভারে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরিয়া যাইতেছে, দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখের এক টুকরা খবর প্রকাশ করিবার স্থান তাহাতে হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই অথচ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনকুবেরের পকেটজাত হইতেছে কোটী কোটী টাকা মুনাফা আর মেহনৎকারী জনমানবের উপর দারিদ্র্য ও শোষণের বোঝা দিনের পর দিন ভারী হইয়াই চলিয়াছে। একদিকে চোরাকারবার, ফাটকাবাজী ও কল্পনাতীত মুনাফা অন্যদিকে দুঃখ, দারিদ্র্য, বেকারসমস্যা—বর্ত্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এই এক ছবি। ভারতবর্ষ তাহার ব্যতিক্রম নহে। আশু কর্ত্তব্য যেখানে মুদ্রাস্ফীতির আসল কারণ বাহির করিয়া দুঃখ ও দৈন্য হইতে দেশের অধিক সংখ্যক লোককে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া, সেখানে নেতারা মুখে বড় বড় কথার অন্তরালে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ও তাহাদের জনসাধারণকে অধিকতর লুণ্ঠনের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইয়া সমাধানের পথ খুঁজিতেছেন।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির যথেষ্ট বাধা দিয়া তাহাকে ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় ভারতীয় শিল্পপ্রগতি চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হয়, এবং এই কৃত্রিম বাধানিষেধের ফলে জমির উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে ও অধিকসংখ্যক জনসাধারণ কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। ইহার উপর ক্রমান্বয়ে আবাদী জমির পরিমাণ ও জমির উৎপাদিকাশক্তির অবনতির জন্য ফসলের হ্রাস ভারতীয় কৃষক সমাজকে দুর্দশার শেষপ্রান্তে লইয়া যাইতেছিল। ১৯২১-২২ সালে যেখানে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ১৫৮৬ লক্ষ একর ১৯৪২ সালে তাহা নামিয়া আসে ১৫৬৫ লক্ষ একরে; ফসলের অবস্থাও সেইরূপ ১৯২১ সালে মোট উৎপাদিত ফসল ৫৪৩ লক্ষ টন আর ১৯৪১—৪২ সালে তাহা ৪৫৭ লক্ষ টন। যুদ্ধের মধ্যে চাষের জন্য যন্ত্রপাতি, অন্যান্য সরঞ্জাম ও জীবনযাত্রার ব্যয় এইরূপভাবে বাড়িয়া যায় যে তাহাতে অধিকসংখ্যক ভারতবাসী ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এই প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বাজিয়া উঠে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশশক্তি যুদ্ধের মালপত্র নিজের দেশ হইতে আনা অসম্ভব দেখিয়া ভারতীয় বাজার হইতে কিনিবার বন্দোবস্ত করিল। এই ক্রয়ের পরিমাণ যে কিরূপ বিরাট তাহা নীচের ফিরিস্তি হইতে বোঝা যাইবে।

সরকারী ক্রয়

১৯৩৯—৪০	সাল	২৮,৭১,৪৮০০০	টাকা
১৯৪০—৪১	,,	৭৮,৭৫,৪৩০০০	,,
১৯৪১—৪২	,,	১,৯৫,৯৮,৫৮০০০	,,
১৯৪২—৪৩	,,	২,৪৭,৭৬,০২০০০	,,
১৯৪৩—৪৪	,,	১,৩৩,৪০,৬৩০০০	,,
১৯৪৪—৪৫	,,	১,৪৫,৪৯,৬৬০০০	,,

(Report of Bombay Millowners' Association, 1945),

প্রাকযুদ্ধ অবস্থায় যে ভারতীয় শিল্প ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা ও সাধারণ ভারতবাসীর দারিদ্র্যের জন্য ধ্বংসন্মুখ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল তাহাই এই বিপুল সরকারী ও সামরিক চাহিদার কল্যাণে দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে এবং শিল্পপতিরাও মুনাফার লোভে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠে। ফলে ভারতীয় শিল্পের উৎপাদনও আশাতীত বাড়িয়া যায়। নীচের বিবরণী তাহার জলন্ত প্রমাণ।

উৎপাদন খরচের উপর অল্প কিছু লাভ দিয়া সরকার এই সব জিনিষপত্র কিনিবেন। তাহাতে শিল্পপতিদের লাভ কিছু কম হইত কিন্তু তাহারা এই কম মুনাফা বেসরকারী ক্রেতাদের নিকট হইতে পোষাইয়া লইবার কাজে বেপরোয়া চোরাবাজারী দামের আশ্রয় গ্রহণ করে। মুণাফার অঙ্কও দ্রুত হারে বাড়িয়া যাইতে থাকে। ১৯২৮ সালের শিল্প মুণাফামান (Industrial Profit Index) ১০০ ধরিলে ১৯৩৯ সালে তাহা ১৫৪.৬

১৯৪০	"	২২০.১
১৯৪১	"	৪৮৯.১
১৯৪২	"	৭৬০.৭

(Recent Social and Economic Trends in India, 1946) অবশ্য ইহা হইতে মোট মুণাফার পরিমাণ জানিবার কোন উপায় নাই। চোরাকারবার হইতে লাভের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি আইনসঙ্গত যে লাভ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যালান্সসিটে দেখান হয় তাহার কথা ধরা হয় তাহা হইলে বোঝা যাইবে কি প্রচণ্ডলাভ ভারতীয় শিল্পপতিরা যুদ্ধের মধ্যে করিয়াছে। বস্ত্রশিল্পে ও চাবাগান গুলিতে মোট আদায়ীকৃত মূলধন যেখানে যথাক্রমে প্রায় ৫০ কোটী ও ৫ কোটীর মত সেখানে এক ১৯৪০-৪৫ সালের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যবসায়ে নীট লাভ ৩৩১ কোটী ও শেষোক্তে ৭ কোটী ২৪ লক্ষ।

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬	
তুলাজাত দ্রব্য—	৪২৭০০	৪০১২০	৪৮৭১০	৪৭২৭০	৪৬৭৬০	(লক্ষ গজ)
কাঁচা লৌহ—	১৫৭৬	১২৭৭	১০৬৮	১০৯৭	১১১৪	(হাজার টন)
ইস্পাত—	৯৭৭	১৮৭৪	২৩৪৪	২১৮৯	২২৬২	,,
সিমেণ্ট—	১৫১২	১৭৩৩	২১১২	২০৪৪	২১৫১	,,
কয়লা—	×	২৯৩৮৮	২৫৫১১	৩৬১১৭	×	

অন্যান্য বিষয়ে লাভের হার এই হিসাবেই ধরিলে ধারণা করা যাইবে মোট লাভ বিষয়ে।

এইরূপ যুদ্ধকালীন লুণ্ঠনের মধ্য দিয়া দুর্বল ভারতীয় পুঁজি ধীরে ধীরে সবল হইয়া উঠিতে থাকে; শুধু সবল নয় একচেটিয়া পুঁজিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। উপরোক্ত প্রচণ্ড মুণাফার মধ্যে আবার পুঁজিপতিকুলের মাথার মণি হাজার করা ৪ জন মোট লাভের হাজার করা ১১০ ভাগ কুক্ষিগত করে। ফলে অতি অল্পসংখ্যক ধণিক গোষ্টির হাতে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর চাবিকাঠি চলিয়া যায়—মাত্র ২৫টি ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম সারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ৮২৬টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হইয়া উঠে। বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ স্বাভাবিক ভাবে বাড়িবার পূর্ব্বেই একচেটিয়া পুঁজিবাদের রূপ লয়। সাম্রাজ্যবাদী ও এই একচেটিয়া পুঁজিবাদের নির্ম্মম শোষণই মুদ্রাস্ফীতির কারণ।

সরকারী সাফাই

অথচ ভারতীয় সরকারের উদ্যোগে যে পণ্ডিত-ব্যবসায়ী-শিল্পপতি মহাসভার অনুষ্ঠান হইয়া গেল তাহাতে এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই হইল না, হইল শুধু বাহিক কয়েকটি লক্ষণের চিকিৎসার কথা; তাহাও আবার লক্ষণগুলিকে মূল রোগের সহিত না দেখিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্নভাবে ধরা হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে যাঁহারা যে কথাগুলি

(৪র্থ পৃঃ দেখুন)

কথা প্রসঙ্গে ঃ

যাক "এতদিনে আঁধিয়ায় হইল অপগত"—সারা ভারতবর্ষে না হ'ক বাংলায় এবার সত্যের আসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেরী নেই বোঝা যাচ্ছে। ভারতীয় জনসাধারণ নেতাদের দিল্লীর গদিতে চড়বার পর নেতাদের কথা ও কাজের সম্পর্ক থেকে এই কথাটাই সাফ বুঝে আসছিল যে তাঁরা যা বলেন কাজে তার ঠিক উল্টাটাই করেন। "রাজনীতি হ'ল সেই রাজ যার কোন নীতি নেই"—রাজনীতির এই 'বীরবলী' সংজ্ঞার অপূর্ব সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তারা নেতাদের এই কথা ও কাজের অমিলকে রাজনীতির চূড়ান্ত চাল হিসেবে ধরে নিয়ে আশ্বস্ত ছিল, বিশেষ করে গরীবেরা। তাই যখন পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল ব্যাঘ্র গর্জ্জনে হাঁকলেন—"টাকা চাই না, চাই শত শত সমাজ সেবক যারা বস্তিবাসীদের ওপর নজর দেবে" তখন বস্তিবাসীরা এতদিনের অভ্যাস মত এর উল্টা মানে করে ভাবল ডাঃ কাটজু সাহেব টাকাই চান। আর তাদের ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেললেও যখন একটা ফুটো পয়সা পাবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নেই তখন তারা নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু সত্যই পাশে বাঘ পড়ল, নেতাদের কথায় আর কাজে মিলে গেল। কাশীপুর থানার অফিসারদের তত্ত্বাবধানে কাশীপুর বস্তিবাসীদের ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হল। আহা তবুও সরকারের কি দয়া! পাছে ঘর ভেঙ্গে দেওয়ার দরুণ তারা অশান্ত হয়ে পড়ে তাই কাঁদুনে গ্যাস আর এংলোইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট, আর নির্ঝঞ্ঝাটে বিনা পয়সায় খাওয়া থাকার পাকা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন খোদ কংগ্রেসী জেলখানায়। মহিলা কয়েদীদের মধ্যে একজন পূর্ণ গর্ভবতী ও আর একজন মরণাপন্ন শিশুর মা। সরকারী বন্দোবস্তে প্রথমোক্ত জন যে ভব যন্ত্রণা থেকে আর দ্বিতীয় জন যে অবাঞ্ছিত বোঝা থেকে বেঁচে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর পরও যদি কেউ পশ্চিম বাংলার মন্ত্রি মণ্ডলীর সমাজ সেবা বোধ সম্বন্ধে সন্দেহ করে বা বস্তিবাসীদের ওপর তাঁদের নজরকে শণির নজরের সাথে তুলনা করে তাহলে তাকে 'দেশদ্রোহী' 'কম্যুনিষ্ট' বলতে হবে।

মুদ্রাস্ফীতি

সমাধানের পথ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে

(৪র্থ পৃঃ পর)

৪১ কোটী টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, শিক্ষায় মোট ব্যয়ের শতকরা ৬ভাগ ব্যয়িত হয়। এইগুলিকে বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতি কতটুকু কমিবে? ১৯৪৫-৪৬ সালে এক বৎসরে সরকার ৩০৬ কোটী টাকা ঋণ পান, ১৯৪৬-৪৭ সালে ৪৭ কোটী এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ১৩ কোটী। ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে আশানুরূপ ঋণ পাইলে যে বাজারে নোট ছাড়িতে হইত না একথা উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যায়। শুধু যে সরকার ঋণ পাইতেছেন না তাহা নহে, ধনিক শ্রেণী পূর্বে যে ঋণ দিয়াছিল তাহা মিটাইবার জন্য সরকারকে নূতন করিয়া নোট ছাড়িতে হইতেছে কোটী কোটী টাকার। সুতরাং বাজারে যে ৯০০ কোটী টাকার নোট ছাড়িতে হইয়াছে তাহার কারণ জনকল্যাণকর প্রচেষ্টার খরচ নহে। মালিকের মুনাফায় যাহাতে আঘাত না লাগে, চোরাকারবার, ফাটকাবাজী জিয়াইয়া রাখিতে হইলে বাজারের যে তেজীভাব জিয়াইয়া রাখিতে হয় তাহার জন্য ধনিক গোষ্ঠি সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন—মন্দা আসুক, সরকার নিশ্চয়ই তাহা চাহেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান কৃত্রিম তেজী বাজার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই অধিক সংখ্যায় নোট ছাড়িতে হইবে" (টাটা কোয়ার্টালী জানুয়ারী ১৯৪৮)। এই উপদেশেই ভারত সরকার চলিয়াছেন। ধনিক শ্রেণীর এই লোভকে সংযত করিবার পরিবর্ত্তে নিম্ন বেতনের কর্মচারী ছাঁটাই ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। Rationalisation করা হইবে। অল্পবেতনে অধিক শ্রম নাকি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। "বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সংকটকে অতিক্রম করিবার মূল নীতি হইল কম খরচে অধিক উৎপাদন"—ইহাই সরকারী নীতি। গরিব জনসাধারণকে অধিকতর শোষণ করিয়া, এবং শিল্পপতিদের মুণাফায় যাহাতে হাত না পড়ে তাহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার চেষ্টা সরকার করিতেছেন।

পণ্ডিত মহাসভার শেষ বক্তব্য বিনিয়ন্ত্রণ প্রথার জন্যই মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় কণ্ট্রোল চালু করিতে হইবে। অবশ্য এই সমস্ত পণ্ডিতরাই কয়েকমাস পূর্বে কণ্ট্রোল তুলিয়া দিবার জন্য চিৎকার সুরু করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের সহযোগিতায় এক বস্ত্র শিল্পে মিলমালিক, পাইকারী ব্যবসায়ীরা ১০০ কোটী টাকার মুণাফা করিলেন ছয় মাসের মধ্যে জনসাধারণকে লুণ্ঠন করিয়া। কিন্তু উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অধিকারে যাহারা জনস্বার্থের প্রতি কোন দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে সমস্ত উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে শুধু বিতরণ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করিলে কি লাভ হইবে? সরকার দাম বাঁধিয়া দিলেও নির্দ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের জিনিস পাওয়া দুর্ঘট এবং অসম্ভবই থাকিয়া যাইবে।

আসল সমাধান

সুতরাং সমাজতন্ত্রী, সরকার, শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞরা যে কারণ দেখাইয়াছেন মুদ্রাস্ফীতির তাহা যেমন একদিকে আসল কারণ নহে তেমনই তাঁহাদের দেখান সমাধানের পথেও সমাধান হইবে না, বরং ধনিকশ্রেণীর মুনাফাকে ঠিক রাখিয়া সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের, শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলিকে নূতন করিয়া আরও কঠোরভাবে শোষণ করার সুবিধা ধনিকশ্রেণীকে দেওয়া হইবে। যতদিন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থাকিবে ততদিন পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের জন্যই নিত্যনূতন করিয়া নব নব অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিবে, আজিকার মুদ্রাস্ফীতি, দুইদিন পরে মন্দা ডাকিয়া আনিবে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় সাম্রাজ্যবাদী-যুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিবে— সাময়িক সামগ্রিক প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য অর্থনৈতিক সংকট স্তিমিত থাকিলে যুদ্ধশেষে আবার মুদ্রাস্ফীতি, আবার মন্দা চলিবে। পুঁজিবাদী আমলে ইহা হইতে বাঁচিবার উপায় নাই। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়, সমাজের অধিকাংশের দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র, বেকারী আর দাসত্ব এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অফুরন্ত মুনাফা— ইহা হইতে স্থায়ীভাবে বাঁচিতে হইলে চাই সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র।

তবে অন্তর্বর্ত্তীকালীন সমাধান হিসাবে চাই— ১। দেশের জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি ২। উৎপাদনের উপর ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়া মালিকানার ধ্বংস ৩। চোরাকারবার, ফাটকাবাজী প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য সামগ্রিক চেষ্টা ৪। সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বন্ধ করা। দেশের জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়াইতে হইলে সর্বপ্রথমে দরকার মূল্যমানের তুলনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি, প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা এবং মুদ্রাসংস্কার করা। মুদ্রাসংস্কারের উদ্দেশ্য যুদ্ধের সময় এবং চোরাকারবার, ফাটকাবাজী প্রভৃতি দ্বারা মালিকশ্রেণী স্ফীতমুদ্রার প্রায় সমস্ত অংশ অধিকার করায় তাহাদের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়শক্তি রহিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা এবং দরিদ্র জনসাধারণের হাতে যে মুদ্রা আছে তাহার ক্রয়শক্তি বজায় রাখা। ইহার জন্য নিম্নতর সংখ্যা বাদ দিয়া উচ্চমূল্যের নোটের মূল্য হ্রাস করাইয়া দিতে ও মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স আটকাইয়া দিতে হইবে। অথচ ইহা করিবার পরিবর্ত্তে ধনিকশ্রেণী—"সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়া দিতে হইবে মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করা কিংবা ব্যাঙ্কের জমা আটকান বা একশত টাকার নোটের দাম কমান তাঁহাদের আদৌ উদ্দেশ্য নহে"—দাবী করিবা মাত্র ভারত-সরকার তখনই তাহাতে রাজী হইয়া জানাইয়াছেন — "বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করিতেছি যে মুদ্রামূল্য হ্রাস করার কোন প্রস্তাবে সরকার কান দিবেন না। আমি বিশেষ করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট ঘোষণা করিতে চাই একশত টাকার নোটের দাম সরকার কমাইবেন না"।

শিল্প ও ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ করিতে না পারিলে উৎপাদনের উপর মালিকশ্রেণীর একচেটিয়া কতৃত্ব ধ্বংস করা, জাতীয় প্রয়োজনানুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় না। অথচ সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক মেহতা পর্য্যন্ত বলিতেছেন—"ব্যাপক জাতীয়করণের হুজুগে মাতিবার প্রয়োজন নাই এমন কি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের পরামর্শমত জমিদারীপ্রথার বিলোপেরও দরকার নাই।" মাহিনা বৃদ্ধি, জমিদারী প্রথার বিলোপ, শিল্প ও ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় করণ, ও নিয়ন্ত্রন প্রথা চালু করিলেই চোরাকারবারের পথ অনেকাংশে বন্ধ হইবে এবং তাহার সহিত রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি ও চোরাকারবারীকে কঠোর সাজা দিলেই চোরাকারবার বন্ধ হইবে।

দিনের পর দিন ভারতবর্ষে বিদেশী লগ্নিপুঁজির পরিমান যে ভাবে বাড়িতেছে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিনা খেসারতে সমস্ত বিদেশী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে ভারতবাসীর দুঃখ দারিদ্র অনেকাংশে কমিবে অথচ সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশও বিদেশী পুঁজিকে ভারতবর্ষে আবাহন করিয়াছেন।

কিন্তু যে ধরনের জনসাধারণের রাষ্ট্র হইলে এই সমাধানের পথ গ্রহণ করিতে পারে ভারতীয় রাষ্ট্র তাহা নহে। সুতরাং পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের নিকট মুদ্রাস্ফীতির সমাধান আশা করা বৃথা বরং ক্রমে ক্রমে নগ্ন ফ্যাসিবাদী অত্যাচারে শোষিত জনসাধারণকে অধিকতর শোষণ করিয়া ধনতান্ত্রিক অর্থে অর্থনৈতিক সংকট কাটাইবার চেষ্টা হইবে। তাহাকে রোধ করিতে হইলে চাই পুঁজিবাদবিরোধী বামপন্থীঐক্যফ্রণ্ট গঠন, সংগ্রাম ও জনরাষ্ট্র কায়েম করা।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের হাল

পাকিস্তান সরকারের জমিদার-জোতদার তোষণনীতির

★ ফলে জনসাধারণের দুরবস্থা ★

পূর্ব্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যার ফলে জনসাধারণের জীবন-যাত্রা অত্যন্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়িয়াছে; ঘুণে-ধরা জমিদারী প্রথার অব্যাবস্থার ফলে চাষী সমাজের মরণ অবস্থা আসিয়াছে, জিনিষ পত্রাদির মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী চূড়ান্ত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে; মজুর শ্রেণী অর্থ- নৈতিক সংকটের চাপে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতেছে। অথচ পাকিস্তান সরকারের জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব এবং মালিক জমিদার গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষার মনোভাবের ফলে জনসাধারণ পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্বন্ধে হতাশ হইয়া নিজেদের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে নিজেরাই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। জনমনের এই অসন্তোষ ধীরে ধীরে আন্দোলনের রূপ লইতে যাইতেছে এবং সরকারও আন্দোলন ধ্বংস করিবার জন্য দমননীতির আশ্রয় লইতেছে। কমরেড প্রমোদ সিংহ রায় সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তান পরিভ্রমন করিয়া তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। (সঃ গঃ)

পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা আজকে অন্নসমস্যা। পূর্ব্ব পাকিস্তানে ভারতে ও পাকিস্তানের যে কোন প্রদেশের চেয়ে চাল উৎপন্ন হয় বেশী। কিন্তু সেখানেই আজ চালের অভাবে, প্রতিটি চাষীর ঘরে, মজুরের ঘরে, নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরে উঠেছে হাহাকার। চালের দর ৩০৲ থেকে ৪৫৲ টাকা, ৪৫৲ থেকে ৫০৲-৬০৲ টাকা ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের করাল-ছায়া নেমে আসছে ধীরে ধীরে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জেলায় জেলায়। চালের দরের সাথে সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দরও বেড়ে যাচ্ছে। মাছ, দুধ, তরিতরকারীর মূল্য সাধারণের ক্রয়শক্তির বাইরে। এর উপর আছে কাপড়ের অভাব। কোলকাতা থেকে বেআইনী ভাবে যে সমস্ত কাপড় চালান হয়ে আসে, সেগুলি কেনবার সাধ্য অনেকেরই হয় না। ফলে প্রায়ই দেখা যায় কোন নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে তার স্ত্রী উলঙ্গ হয়ে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াটাই শ্রেয় মনে করেছে। আরও দেখা যায় ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কোন গরীব চাষী আত্মহত্যা করেছে।

পাকিস্তান আজ এক বৎসর হলো কায়েম হয়েছে। কিন্তু এই হলো পাকিস্তানের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী প্রদেশের অবস্থা। পাকিস্তান কায়েম হবার পূর্ব্বে মুসলিমলীগনেতারা কত গালভরা আশ্বাস দিয়েছিলেন তাদের মুস্লিম ভাইদের, পাকিস্তানের এমন সুন্দর ছবি তুলে ধরেছিলেন তাদের সামনে কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পর এত আশা এত আকাঙ্খা সবই ধূলোয় মিলিয়ে গেল। নেতাদের আশ্বাসের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে, তাদের প্ররোচনায়, জনসাধারণ পাকিস্তান কায়েম করবার জন্য জান কবুল করেছিল, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু আজ নেতাদের বিশ্বাস-ঘাতকতা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের কাছে। গরীব চাষী, মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত আজ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছে এই নেতাদের স্বরূপ। তারা বুঝতে পারছে যে নেতারা আজ ক্ষমতার গদিতে আসীন, তারা নিজেরাও কায়েমী স্বার্থের প্রতি-নিধি এবং কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখতে, কায়েমী স্বার্থকে সর্ব্বপ্রকার আঘাত থেকে বাচাবার জন্য তারা সচেষ্ট। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ জমিদারী প্রথাকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা। পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিদার অধ্যু-ষিত দেশ। জমিদার ও তার চেলা চামুণ্ডা জোতদার ও তালুকদারেরা বহু বৎসর ধরে চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, শোষণ করে, তাদেরই রক্ত জলকরা শ্রমের বিনিময়ে ফুলে ফেপে উঠেছে। সে বর্ব্বর অত্যা-চার ও নির্ম্মম শোষণের কাহিনী শুনলে শিউরে উঠতে হয়। বহুবার প্রজারা বিচ্ছিন্ন ভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, অশেষ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা বরণ করে নিয়েও এ আন্দোলন তারা চালিয়েছে। কিন্তু বিদে-শী সাম্রাজ্যবাদীর সহায়তায় জমিদার গোষ্ঠী চিরদিনই সেগুলি দমন করে এসেছে। স্বাধীন পাকিস্তান কায়েম হবার পর নিপীড়িত পূর্ব্ব-বঙ্গের চাষীদের মনে এই আশার আলো জেগে উঠেছিল যে এতদিনের অত্যাচার, এতদিনের শোষণের সত্যিই অবসান হবে। তাদের জমির মালিক তারাই হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ধান তারা উৎপন্ন করে, সে ধান তাদেরই ঘরে উঠবে। কিন্তু অচিরেই সে আশার আলো নিবে গেল। কে করবে জমিদারী, জোতদারী প্রথার কবসান? যারা এই ঘৃণ্য প্রথা অবসানের মালিক, তারাই যে বড় বড় জমিদার, জোতদার। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো গরীব চাষীরা। বজ্রকণ্ঠে একযোগে দাবী জানালো, "এ প্রথার অবসান করতেই হবে"। "লাঙ্গল যার জমি তার"। বিপদ দেখে নেতারা পরিষদে বিল উথাপন কর-লেন। জমিদারী প্রথার অবসান হলো বলে জয়ঢাক বাজাতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণের মাত্রাটা দেখেই ঢাক বাজানোর তাৎপর্য্য ভালভাবেই বোঝা গেল। আবার প্রতিবাদ উঠলো। নেতারা তখন কাশ্মীরের দিকে, হায়দ্রা-বাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বললেন। বিল ধামাচাপা পড়ে গেলো। অথচ এই জমিদারী ও জোতদারী প্রথার অবসান হলে, চাষীর হাতে জমি আসলে, খাজনা ও উদ্বৃত্ত শষ্য বাবদ যে অর্থাগম হয় তাতে গরীব পাকিস্তানের জনসাধারণের অনেক উন্নতি হয়। আর একটি বিশ্বাসঘাতকতা হলো রাষ্ট্রভাষা স-ম্পর্কে; অবাধে দমণনীতি চালিয়ে এইঅতি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রাথ-মিক দাবীকে এবং তার জন্য আন্দো-লনকে অঙ্কুরেই গলা টিপে হত্যা করলো। সমগ্র পাকিস্তানের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের অনেক বেশীলোকের ভাষা বাংলা। অথচ এই বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবার অধিকার পেলোনা। উর্দ্দু ভাষাকেই জোড় করে রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হলো। প্রগতিশীল মুস্লিম ছাত্র সমাজ গণ-তান্ত্রিক যুব লীগের নেতৃত্বে অপূর্ব্ব আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লো। সমগ্র জনসাধারণ হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সাধারণ ধর্ম্মঘট করে তাদের সমর্থন জানালো। কিন্তু স্বৈরাচারী নেতৃত্ব কোন কথাই শুনলেন না। গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম্ শাসিয়ে গেলেন বাংলা ভাষা কিছুতেই রাষ্ট্র ভাষা হতে পারবে না এবং যারা এর পক্ষে আন্দোলন চালাচ্ছে তারা সব পঞ্চমবাহিনীর দল। এদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে; করলেনও তাই। ছাত্রদের উপড় গুলি, লাঠি চললো। গণতান্ত্রিক যুব লীগের নেতা সামশুল হক ও আরও অনেক ছাত্র নেতা গ্রেপ্তার হলো, যুব লীগের সংগঠক এম, এ, আওয়াল ঢাকা বিভাগ হতে বহিস্কৃত হলো, প্রগতিবাদী পত্রিকা 'ইন্‌ছান্' 'ইন্‌সাফ' বন্ধ করে দেওয়া হলো। এর উপর আরম্ভ হলো সরকারের সই গুণ্ডাবাহিনীর বর্ব্বর অত্যাচার; অত্যা-চারের তাণ্ডব নীতি পূর্ণবেগে চলতে লাগলো প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও প্রগতিশীল ভাবধারার উপর। সে দমন-নীতির, সে অত্যাচারের ঝড় আজও সমানভাবেই বয়ে চলেছে। তাই আজ দুর্ভিক্ষের যন্ত্রনা সহ্য করেও পূর্ব্ব পাকিস্তানের গরীব জনসাধারণ মুখ ফুটে কথা বলতে পারছেনা। তাদের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ। সর্ব্বদিক দিয়ে দমণনীতি চালিয়ে, প্রয়োজন হলে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব জাগ্রত গণশক্তির গলা টিপে ধরছে। কায়েদে আজম প্রথম গদিতে বসেই ঘোষণা করেছিলেন—Hindus will politi-cally cease to be Hindus, Mus-lim will politically cease to be Muslims, they will be all com-mon citizen of the State Pakis-tan. কিন্তু একথা দুদিনেই তাঁর অনুচরেরা ভুলে গেলেন। ইস্‌লামিক রাষ্ট্র এই পাকিস্তান। ইসলামের আদর্শে, পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে, এই আওয়াজ তুলে জনসাধারণের প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মোড় প্রতিক্রীয়াশীলতার দিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন। এবং যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা নিয়ে তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া নিয়ে এগিয়ে এলেন, তাদেরকে হয় রাষ্ট্রের পঞ্চম বাহিনী, নয় রাষ্ট্রের শত্রু বলে অভিহিত করলেন।

পাকিস্তানের গরীব জনসাধারণ চিরদিন এ অত্যাচার, এ শোষণ সহ্য করবে না। যে অসন্তোষ যে বিক্ষোভ, দিনের পর দিন জমে উঠছে, তাই একদিন সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে পরি-চালিত হয়ে গণ-আন্দোলনের ভেতর গড়ে উঠে সফল বিপ্লবের রূপ নেবে। সেই বিপ্লবের আঘাতে আজকের এই প্রতিক্রীয়াশীল সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা

(৬ষ্ঠ পৃঃ দেখুন)

মুদ্রাস্ফীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে এই—১। বাজারে জিনিষপত্র কম অথচ চলতি টাকার পরিমাণ অনেক বেশী ২। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে ফলে আবার বেতন বৃদ্ধির দাবী আসে এবং অধিকতর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ৩। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মাহিনা দিবার এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়প্রার্থীর জন্য খরচ করিবার জন্য বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য বহু নোট ছাপিতে হইতেছে ৪। বিনিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে। ইহার প্রতিকার হিসাবে উৎপাদন-বৃদ্ধির, শ্রমিক কর্ম্মচারীর মাহিনা বৃদ্ধি বন্ধ, শিল্পে Rationalisation, সরকারী কর্ম্মচারী ছাঁটাই, দেশোন্নয়ন-কার্য্যে খরচ কমান, বিদেশী পুঁজি আমদানীর ব্যবস্থা, মদ্যবর্জন পরিকল্পনা বর্জন প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। এইবার বিচার করিয়া দেখা যাক প্রত্যেকটি বিষয়।

জিনিষ পত্রের অভাবই যদি মুদ্রাস্ফীতির কারণ হয় এবং উৎপাদন বাড়াইলেই যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত তাহা হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিত না। কলকারখানার উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকায় উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলণায় যথেষ্ট বাড়িয়াছে অথচ সেখানে চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতি—যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হু হু করিয়া বাড়িতেছে, এক খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যই শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে; নিউইয়র্ক সহরে ইহা অপেক্ষা আরও বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ৬৩ ভাগের মত। জনসাধারণের জীবনধারণের মান মার্কিন মুল্লুকেও দিনের পর দিন কমিতেছে অথচ ১৯৪৮ সালের প্রথম তিন মাসে পূর্ব বৎসরের তুলণায় বিভিন্ন শিল্পে সেখানে শতকরা ২৬ ভাগ মুণাফা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের বেলায়ও অনেক শিল্পে উৎপাদন বাড়িয়াছে। শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রাম স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন "বস্ত্র শিল্পে উৎপাদন বাড়িয়াছে, কয়লা ও শর্করা শিল্পেও"। ইহার কিছু সুফল ভারতের অর্থনৈতিক বাজারে লক্ষ্য করা উচিত ছিল অথচ সুফলের পরিবর্তে "বাড়তি উৎপাদনের দায়েই খনি এলাকায় শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে" এই কথা মন্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং সরকার, শিল্পপতি ও সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ পর্য্যন্ত যে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তারস্বরে চিৎকার করিতেছেন সেই উৎপাদন বাড়িলেও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি হইতে রেহাই পাইবার উপায় নাই। তথাপি শুধু এই টুকু বলার অর্থ শ্রমিক শ্রেণীকে তাহার দাবী আদায়ের প্রাথমিক ধর্ম্মঘটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা। তাই সরকার পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া আই, এন, টি, ইউ, সির নেতা পর্য্যন্ত সকলেই উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে দায়ী করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। কয়েক বৎসরের ধর্ম্মঘটের তুলনা মূলক আলোচনা হইতে ইহার প্রমান মিলিবে।

	শ্রমিকেরসংখ্যা	শ্রমদিননষ্ট
১৯৪২সালে ধর্ম্মঘটী	৭,৭২,০০০	৫৭৭৯০০০
১৯৪৬ ,, ,,	১৯৬১০০০	১২৭১৭০০০
১৯৪৭ (প্রথম ৩মাসে)	৫,৫২০০০	৫২৩৪০০০

১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিক পর্য্যন্ত সামান্যই ধর্ম্মঘট হইয়াছে অথচ তখন হইতেই উৎপাদন হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং উৎপাদন হ্রাসের জন্য মজুর শ্রেণীকে দায়ী করা যাইতে পারে না। উৎপাদন হ্রাসের কারণ অন্যত্র নিহিত আছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় মুনাফা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন কমিতে থাকে, সমাজে চাহিদা আছে, উৎপাদিকা শক্তি আছে কিন্তু তথাপি উৎপাদন কমে। ১৯৪৩ সালে সর্ব্বপ্রথম নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হয় তাহাতে মালিক শ্রেণী মুনাফা কমিয়া যাইবার ভয়েই উৎপাদন কমাইয়া দেয়। তাহার পর যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে যখন সরকারী ক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়া গেল এবং দরিদ্র দেশবাসী শিল্প দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা হইল তখন সমস্ত উৎপাদন তাহাদের মধ্যে বিক্রয় করিতে হইলে দাম অনেকাংশে কমাইয়া আনিতে হয় ফলে মুনাফার পরিমান কমিয়া যায়। ইহার জন্য উৎপাদন হ্রাস করিয়া কৃত্রিম উপায়ে চড়া দামকে বজায় রাখিয়া লাভের পরিমানকে অব্যাহত রাখা হইল। পুঁজিপতিদের এই মুনাফা-লোভই উৎপাদন হ্রাসের কারণ। একচেটিয়া পুঁজিবাদ প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নীতি প্রয়োগ করিয়াই মুদ্রাস্ফীতি ডাকিয়া আনে। আর দেশে যদি জিনিষ পত্রের অভাবই থাকে তাহা হইলে এখনও কেন বিদেশে মাল রপ্তানী করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে? কেনই বা সরকারী বিভাগ হইতে রপ্তানী বিষয়ে উৎসাহ দিয়া বলা হইতেছে—বহির্বাণিজ্যই দেশের আর্থিক উন্নতির কম্পাস! রপ্তানী সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি নিষেধ ছিল সরকার মালিক শ্রেণীর স্বার্থে তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়াছেন এবং আইনসঙ্গত ও বেআইনীভাবে বহু কোটী টাকার মাল দেশে চাহিদার তুলনায় অল্প হইলেও বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। সুতরাং প্রথমোক্ত বক্তব্য হিসাবে যে কারণ দেখান হইয়াছে মুদ্রাস্ফীতির, তাহা অচল।

পণ্ডিত প্রবরদের দ্বিতীয় বক্তব্য হাস্যকর। তাঁহাদের মতে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, তাহার ফলে জিনিষ পত্রের দাম আরও বাড়ে এবং আরও উচ্চহারে বেতনের দাবী আসে। এই ভাবেই সঙ্কট আরও বাড়িয়া যায়। জন্য মুদ্রাস্ফীতি কমিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয়নাই। তাহার কারণ বেতন বৃদ্ধির পিছনে মুদ্রাস্ফীতি চলে না বরং তাহার উল্টাই ঘটে—মুদ্রাস্ফীতির পিছনেই মজুরী দৌড়ায়।

সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক মেহতা "মজুরী দর ও মুনাফা যেখানে আছে সেখানে বাঁধিয়া রাখিয়া" "সঞ্চয়" ও "সমবেত প্রচেষ্টায়" মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করিবার আওয়াজ তুলিয়াছেন। সত্যই যদি জিনিষ পত্রের দর ও মুনাফা না বাড়ে তাহা হইলে মজুরী বৃদ্ধি করা হইবে কেন—একথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পে কমিশনের রায় হইতে নেতাদের শেষ বক্তৃতা সকল স্থানেই বলা হইয়াছে দাম কমাইতে হইবে। মাসে মাসে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাহিনাও বাড়ে নাই তথাপি প্রতিমাসেই জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে কেন? সুতরাং দর বাঁধিয়া দিবার নাম করিয়া যদি কোন রকমে মজুরী বাঁধিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে শ্রমিককে ফাঁদে ফেলা যায় এই উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত আওয়াজ। আর মুনাফা বাঁধিবার প্রশ্নই যদি উঠে তাহা হইলে বলিতে হয় মুনাফা যে হারে বাড়িয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে তাহাকে আরও বাড়াইবার সুযোগ নাই। আমাদের পূর্বের হিসাব হইতে তাহার প্রমান মিলিবে। এই বর্দ্ধিত মুনাফার তুলনায় শ্রমিকও কর্মচারীদিগকে ও ন্যায্য বেতন ও বোনাস দেওয়া হয় নাই সুতরাং মজুরীকে বাঁধিয়া দিলে মেহনৎকারী জনসাধারণই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে ধনিক শ্রেণীর কোন অসুবিধাই হইবে না। জনসাধারণকে সঞ্চয়ের কথা তাঁহারাই বলিতে পারেন যাঁহারা রাজভোগে আছেন, এবং তাহাদের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে কণামাত্র যাঁহাদের পরিচয় নাই।

পণ্ডিত প্রবরদের তৃতীয় বক্তব্য সরকারী কর্মচারীর সংক্ষাবৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের বেতন দিতে এবং আশ্রয়-প্রার্থী, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনউন্নয়ণকর প্রচেষ্টার ব্যয় বহনের জন্য সরকারী বাজেটে যে ঘাটতি দেখা দিতেছে তাহা পূরণের জন্য অধিক সংখ্যায় নোট ছাপিতে হইতেছে; ইহার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি। সুতরাং সরকারীকর্মচারী ছাঁটাই করিতে হইবে ও জনউন্নয়ন কার্য্য আপাততঃ বন্ধ রাখিতে হইবে। সরকার আজ পর্য্যন্ত আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য মোট ৩৫ কোটী খরচ করিয়াছেন, প্রদেশগুলিকে উন্নয়ণ করিতে ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট

(২য় পৃঃ দেখুন)

● কংগ্রেসী-সরকারের
● শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞের
● সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশের
পরিকল্পনা
ধনিক শ্রেণীর মুনাফা ঠিক রাখিবে

★ কংগ্রেসী সরকারের অর্ডিন্যান্স রাজের বিরুদ্ধে ২৫শে ★ সেপ্টেম্বর 'দমন-নীতি বিরোধী দিবস'

নিখিলভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সারা ভারতে 'দমন-নীতি বিরোধী দিবস' পালনের জন্য আহ্বান জানায়; কংগ্রেসীসরকার বিভিন্ন প্রদেশে প্রগতিশীল বামপন্থী আন্দোলন ধ্বংসের জন্য যে নিরঙ্কুশ দমন নীতি চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধেই ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের এই আহ্বান; কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে যে দেশের জনসাধারণের সামাজিক অর্থনৈতিক নানাবিধ দুঃখ দুর্দ্দশার দূরীকরণের কোন চেষ্টাত নাইই উপরন্তু দেশের অল্পসংখ্যক ধনিক-মালিক, জমিদার-জোতদার, রাজা-মহারাজার স্বার্থ রক্ষার জন্যে বৃহত্তর জনসাধারণের উপর দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে। জমিদারী প্রথার বিলোপ করে চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টনত দূরের কথা, পরিবর্ত্তে চাষীর জমি জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার কাজে জমিদারদের সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, খাজনা কমানোর পরিবর্ত্তে খাজনা বেড়ে যাচ্ছে। চাষীদের কাছ থেকে অল্পমূল্যে ধান ক্রয় করা হয় অথচ বাইরে চোরাকারবারের কল্যাণে চাউলের মূল্য অগ্নিমূল্য—স্বভাবতঃই এই সব কারণে ভারতের চাষীদের মনে তীব্র অসন্তোষ জমে উঠছে।

দেশের মূল্যবৃদ্ধি অনুপাতে শ্রমিকের বেতন বাড়ছে না, উপরন্তু মজুর কর্ম্মচারীর ছাটাই চলছে; মালিকের মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে শোষণ, অত্যাচার জুলুম বন্ধ না করে মজুরকে শিল্পে শান্তি রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির নামে চাপ দেওয়া হচ্ছে, ট্রাইব্যুনালের নামে মজুরের দাবী দাওয়াকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরাণী ও দেশের শিক্ষক সমাজ অবহেলিত অবস্থায় আছে, তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি বা অন্য কোন দাবী দাওয়ার স্বীকৃতিত হচ্ছেই না উপরন্তু জোর করে হুমকি দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলেছে।

জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্ব্বিসহ হয়ে পড়েছে; জিনিষপত্রের দাম নাগালের বাইরে, দুবেলা পেটভরে খাওয়া ত দূরের কথা অর্দ্ধাহার, অনাহারে বেশির ভাগ লোকের দিন যাচ্ছে, শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, দুর্নীতি, চোরাকারবার, স্বজন প্রীতি, ধনিক-মালিক তোষণ প্রভৃতিতে জনসাধারণের মনে দিন দিন বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই পুঞ্জিভূত অসন্তোষই যখন গণ-বিক্ষোভে, বিশেষ করে মজুর আন্দোলন চাষী-আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ কচ্ছে তখন কংগ্রেসী সরকার ও মারমুখী হ'য়ে পড়ছে। দিকে দিকে শ্রমিক ছাত্র-কর্ম্মচারী-শিক্ষক এমন কি পুলিশ ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও ধর্ম্মঘটের ঢেউ দেখা যাচ্ছে। জনমনে এই জাগ্রত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখে কংগ্রেসী সরকার চূড়ান্ত অত্যাচারী ফ্যাসিস্ত নীতির আশ্রয় নিয়েছে। অর্ডিন্যান্স জারী করা, সভা সমিতি বেআইনী ঘোষনা করা, সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা, বিনাবিচারে প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনৈতিক ও ট্রেডইউনিয়ন কর্ম্মীদের আটক রাখা, ধর্ম্মঘট বেআইনী করে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করাই হয়েছে কংগ্রেসী সরকারের একমাত্র নীতি। এক কথায় বলতে গেলে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গলদের জন্যে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সেই সঙ্কটের হাত থেকে ত্রাণ না পেয়ে এই সংকট উত্তীর্ণ হবার যে পথ খোলা আছে সেই সমাজ ব্যাবস্থা পাল্টে ফেলে দেওয়ার পথ যারা বেছে নিয়েছেন তাদের উপরই নেমে আসছে ফ্যাসিষ্ট জুলুম ও বর্ব্বরোচিত অত্যাচার। জনসাধারণও পরিষ্কার বুঝতে পারছে কংগ্রেসী নেতারা স্বাধীনতার নামে দেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়িয়েছে। তাই এই ফ্যাসীবাদ রোধ করবার জন্যেই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ভিত্তি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আহ্বান জানিয়েছে সারা ভারতের মেহনতকারী জনসাধারণের কাছে ২৫শে সেপ্টেম্বর 'দমণ-নীতি বিরোধী দিবস' পালন করতে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই আহ্বান সমর্থন করেছে ভারতের প্রতিটি প্রগতিশীল, সাত্যকারের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী দল ও প্রতিষ্ঠান। ফরোয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর-এস-পি, আর-সি-পি, বলশেভিক পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরো, ছাত্র কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠান, যুক্ত বামপন্থী-ফ্রন্ট (বিভিন্ন বামপন্থী দলের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট,) কিষাণ সভা, নিখিল ভারত যুক্ত কিষাণ সভা প্রভৃতিও সমর্থন করেছে এই 'দমন নীতি বিরোধী দিবস'। এই ডাকে শুধু সাড়া দেয় নাই তাহারাই যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচার ও ফ্যাসিস্ত নীতিকে সাহায্য করছে—তাদের মধ্যে আছে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, জয়প্রকাশের সোস্যালিষ্ট পার্টি ও তাদের মজদুর পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি।

কলকাতায় 'দমন নীতি বিরোধী দিবস'

কলকাতা—কলকাতায় 'দমন-নীতি বিরোধী দিবসের' বহু পূর্ব্বে থেকেই বিভিন্ন কলকারখানায়, অফিসে, স্কুল কলেজে মজুর কর্ম্মচারী, ছাত্র শিক্ষকদের ধর্ম্মঘটের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল; আন্দোলন ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল সারা ভারতব্যাপী গণ বিক্ষোভ সৃষ্টির জন্যে। এই আন্দোলনের ধারাটি কংগ্রেসী সরকার ঠিক বুঝেছে, তারা অনুভব করতে পেরেছে এই বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলি দানা বেধে ব্যাপক গণবিক্ষোভের দিকে যাচ্ছে। তাই 'দমন-নীতি বিরোধী দিবসের' অনেক পূর্ব্বেই কলকাতায় জারী হয়েছে বহু নিন্দিত ১৪৪ ধারা, সভা সমিতি শোভাযাত্রা ও ধর্ম্মঘটকে করা হয়েছে বেআইনী—বহু কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছে। তবু এই ধরণের অত্যাচারের সম্মুখে দাড়িয়েও কলকাতা তথা বাংলার বিভিন্ন বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠান সমর্থন জানিয়েছে ও আহ্বান করেছে জনসাধারণকে এই দিবস পালনের জন্যে।

সভা শোভাযাত্রা করা ১৪৪ ধারার জন্যে বন্ধ, তাই প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি কলকাতার জনসাধারণের। প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে অনুমতি দেওয়া হয়নি প্রকাশ্য সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করতে; তাই টি-ইউ-সি থেকে করা হয়েছিল মুসলিম ইনষ্টিটিউটে এক প্রতিনিধি সভা প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা মারফত। সভা সমিতি করতে না দিলেও 'দমন-নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমতের অভিব্যক্তি বন্ধ করতে পারেনি কংগ্রেসী সরকার। কলকাতার সংগ্রামী জনসাধারণ তাদের মত ব্যাক্ত করেছে রাস্তার প্রাচীরে প্রাচীরে পোষ্টার ও ইশতেহার লাগিয়ে। সারা কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার প্রাচীরে সেদিন দেখা গেছে দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন প্রকারের ইশতেহার ও প্রাচীর পত্র; তার মধ্যে বিশেষ করে চোখে পড়েছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বহু পোষ্টার ও প্রাচীর পত্র; কংগ্রেসী পুলিশকে ও বিশেষ ব্যস্ত দেখা গেছে এই সব প্রাচীর পত্র ও ইশতেহার ছিড়ে ফেলতে!

টি-ইউ-সির উদ্যোগে মুসলীম ইনষ্টিটিউট হলে প্রতিনিধি সভা ডাকা হয়েছিল, সভায় সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীযুক্ত মৃনাল কান্তি বসু। তিনি বিভিন্ন প্রস্তাবে অর্ডিন্যান্স জারীর বিরুদ্ধে, ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার বিরুদ্ধে, সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করার বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের 'জাতীয় জরুরি অর্ডিন্যান্স' ও প্রাদেশিক সরকারের সিকিউরিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কমরেড প্রমোদ সিংহ রায় বলেন যে এই দিবসে শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব শুধু প্রতিবাদ জানানোই নয়, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার মারফত এই ধরণের দমণ নীতি ও অত্যাচারকে রোখাই বড় দায়িত্ব।

ধনতন্ত্রকে বাচিয়ে রেখে চলতে চেষ্টা করে যে সরকার তার পক্ষে ধনতন্ত্রের সংকট কাটানোর একমাত্র পথই হচ্ছে জনসাধারণের সমস্যার সমাধান না করে তার ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন ধ্বংস করে মালিক শ্রেণীকে তোষণ করা। এই পথ ব্যর্থ জেনেও অত্যাচারের মাত্রা তাকে বাড়াতে হয়, শুধু গুলি আর লাঠির জোরে জনসাধারণের অসন্তোষ দাবাবার চেষ্টা করতে হয়।

তাই দেশে আজ এত অর্ডিন্যান্স এত গ্রেপ্তারের পালা। সাথে সাথে জনসাধারণকে আবার ধোকা দিতে হয়, মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, দালাল তৈরি করতে হয়। শিশু রাষ্ট্রের দোহাই পেড়ে পুরোনো ঘুনে ধরা সামাজ্যবাদী—ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র যন্ত্রকে কায়েম রাখতে হয়।

কমরেড সিংহ রায় তাই আহ্বান জানান জঙ্গী মজুর শ্রেণীর কাছে বিপ্লবী আন্দোলনের মারফত নূতন কংগ্রেসী সরকারের পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেলে নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যাবস্থা গড়ে তোলার পথ প্রস্তুত করতে, লড়াই এর ভেতর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে।

আর-সি-পি-আইর কমরেড অনাদি দাস বলেন "প্রতিবাদ জানিয়ে শুধু কান্নাকাটি করব না আমাদের আজকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে। তার জন্য তৈরি হন।"

(৬ষ্ঠ পৃঃ দেখুন)

কমরেড শিবদাস ঘোষের বিহার প্রদেশের বিভিন্ন শ্রমিক কৃষক অঞ্চল পরিভ্রমন

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমাংশে বিহার প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করেন; কমরেড ঘোষ বিশেষ করে পূর্ব্ব বিহারের মানভূম, এবং সিংভূম জেলার জামসেদপুর, ঘাটশিলা, মৌভাণ্ডার, সিন্ধ্রি, প্রভৃতি স্থানে যান। প্রত্যেকটি স্থানেই তিনি কয়েকদিন করে থাকেন এবং এই সমস্ত স্থানের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের স্থানীয় সংগঠকদের সাথে আলাপআলোচনা, বৈঠক প্রভৃতি করেন এবং সংগঠনের প্রসার সম্বন্ধে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য ঘাটশিলায় বিহার প্রদেশের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্ম্মীদের সাথে এক আলোচনা সভা করেন। এই সভায় বিভিন্ন স্থানের সংগঠনের রিপোর্টের উপর আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আগামী আড়াই মাসের মধ্যে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকার চেষ্টা করা হবে।

মৌভাণ্ডার—মৌভাণ্ডারের ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে কমরেড ঘোষের আলোচনা এবং ঘরোয়া সভা হয়। কপার করপোরেশন মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড মন্মথ ত্রিপাঠি এবং ইউনিয়নের অন্যান্য সংগঠকেরা দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কমরেড ঘোষের সহিত আলোচনা করেন। ১৪৪ ধারা জারী থাকার ফলে কোন জনসভা করা সম্ভব হয় নাই, তার জন্য স্থানীয় শ্রমিকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের সহিত আলাপ আলোচনা এবং ঘরোয়া সভা করেন; জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দালালী রাজনীতির ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মনে এই সব আলোচনা এবং ঘরোয়া সভা বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ছাত্র ব্যুরোর কর্ম্মীদের উদ্যোগে ঘাটশিলা এবং মৌভাণ্ডারের ছাত্র ও যুবকদের-ও ঘরোয়া সভা হয়; বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসী সরকারের নীতি কোন্ পথ ধরে চলছে এবং এই অবস্থায় দেশের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা কি হইবে কমরেড ঘোষ বিশদ ভাবে তা ব্যাখ্যা করেন।

ঘাটশিলা, মৌভাণ্ডার প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের কিষাণ প্রতিনিধিরাও কমরেড ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং কিষাণ সংগঠন গড়ে তোলার কলাকৌশল ও কর্ম্মপন্থা ঠিক করেন।

বিহার প্রাদেশিক খারিয়া (Hilltribes) নেতা কমরেড বলরাম দাস খারিয়া উপজাতীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কমরেড ঘোষের সঙ্গে আলাপআলোচনা করেন।

সিন্ধ্রি—কমরেড শিবদাস ঘোষ সিংভূম জেলার সিন্ধ্রিতে যাবার পর সেখানকার শ্রমিক মহলেও বিশেষ উৎসাহের সাড়া পাওয়া যায়; সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের স্থানীয় সংগঠকদের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামের কৃষক প্রতিনিধি, কলকারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিরা কমরেড ঘোষের সহিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সিন্ধ্রি ফারটিলাইজার প্রোজেক্ট কারখানার শ্রমিকেরা সেখানকার জাতীয় টি-ইউ পরিচালিত ইউনিয়নের শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপে কিছুদিন থেকেই অসন্তুষ্ট হচ্ছিল; শ্রমিক নেতা এবং সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের স্থানীয় সংগঠক কমরেড জ্যোতির্ম্ময় দাসের নেতৃত্বে এই কারখানার শ্রমিকেরা ঘরোয়া সভার আয়োজন এবং জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন গঠণ বিষয়ে আলোচনা করে।

কমরেড ঘোষের সহিত সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বিহার প্রাদেশিক সংগঠক এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড হীরেন সরকারও বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

(৩য় পৃঃ পর)

পূর্ব্ব পাকিস্তান

ভেঙ্গে যাবে, জনসাধারণ নিজেদের রাষ্ট্র, নিজেরাই গড়ে তুলবে, প্রকৃত আজাদী লাভ করবে। পুলিশ ধর্ম্মঘট, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট রাষ্ট্র ভাষার গৌরবময় আন্দোলন, এই বিপ্লবী আন্দোলনেরই ইঙ্গিত জানায়। আজ শ্রমিক শ্রেণীরনেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে প্রগতিশীল মুসলিম ছাত্র সমাজকে, এগিয়ে আসতে হবে হিন্দু মুসলমান চাষী, এগিয়ে আসতে হবে গরীব নিম্নমধ্যবিত্তদের। এই মিলিত শক্তির সংঘবদ্ধ আন্দোলনই বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করবে।

চিঠি—পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

গভর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুলের দুর্নীতি

মহাশয়,

ভারত গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পাকিস্থানের বাস্তুত্যাগী, এবং যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের জন্য কলিকাতার বহু স্থানে কারিগরী (Technical) শিল্প শিক্ষার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করিয়াছেন; এই ট্রেনিং এর জন্য কলকাতায় টালিগঞ্জ, যাদবপুর, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি রোড প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি সেণ্টার খোলা হইয়াছে।

এই সমস্ত সেণ্টারের শিক্ষানবিশদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের আচরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেশে সত্যিকারের অভিজ্ঞ কারিগরী শিক্ষায় পারদর্শী লোক গড়া এবং ব্যাপক শিল্প শিক্ষার প্রসারের পরিবর্ত্তে চিরাচরিত স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি চালাইয়া যাওয়াই কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

ট্রেনিং এর ১বৎসর আমাদের (শিক্ষানবিশদের) মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া হয়; বর্ত্তমান মূল্য সঙ্কটের দিনে ৪০৲ টাকা ভাতায় সংসার চালানো যে কত কঠিন তাহা জনসাধারণ জানে, তদুপরী এই টাকা ও সময় মত পাওয়া যায় না।

কাজের সময় শিক্ষানবিশদের আত্মসম্মানকে কর্ত্তৃপক্ষ আমল দেন না; কথায় কথায় ডিসচার্জ্জ ও সাসপেণ্ড করা হইতেছে, প্রতিবাদ জানাইলে অপমান সূচক ইঙ্গিত বর্ষিত হয় এবং সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার (পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলা) বিষে শিক্ষানবিশদের মন বিষিয়ে দেওয়া হয়।

শিক্ষানবিশদের জন্যে কলকাতার কলেজষ্ট্রীট অঞ্চলের কলাবাগানে এবং গড়িয়াহাটের যশোদা ভবনে দুইটি হোষ্টেল খোলা হইয়াছে। সমস্ত শিক্ষার্থীদের এই দুইটি হোষ্টেলে কোনমতেই স্থান সংকুলান হইতেছে না তথাপি নূতন কোন হোষ্টেলের ব্যবস্থা না করায় ইহাতেই নিতান্ত অসুবিধা সত্বেও থাকিতে হইতেছে। ৪০৲ টাকা ভাতা হইতে মাসিক ২৮৲ টাকা খাওয়া থাকা বাবদ কাটিয়া নেওয়া হয়; অথচ খাওয়ার কুব্যবস্থার জন্যে প্রায়ই শিক্ষার্থীদের অভুক্ত অবস্থায় কাজে যাইতে হয়।

ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিজেদের দুর্নীতি ঢাকিবার জন্যে নিরীহ শিক্ষানবিশদের উপর প্রায়ই দোষ চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোডের ষ্টোরে চুরি হয়; ষ্টোরের চাবি ষ্টোর কিপারের

(৪র্থ কলমে দেখুন)

দমণ নীতি বিরোধী দিবস

(৫ম পৃঃ পর)

আর-এস-পির কমরেড যতীন চক্রবর্ত্তী বলেন "আমাদের আজকের লড়াই করতে হবে সমাজতন্ত্রের জন্যে। কিন্তু আজকের লড়াইকে ধ্বংস করার জন্য দেশীয় ধনিক শ্রেণীর সরকার নানা প্রকার ভাওতা দিচ্ছে, শিশু রাষ্ট্রের দোহাই দিচ্ছে, অত্যাচার করে আন্দোলন ধ্বংস করতে চাইছে। কিন্তু রাষ্ট্র শিশুর মত ব্যাবহার না করে ঝানু বৃদ্ধের মত গণ্ডগোল করছে; এই শিশু রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে আমরা চাই কিন্তু তার প্রধান বাধা হিসেবে দাড়ায় এই অত্যাচারী সরকার। সরকারকে সতর্ক করে দিতে চাই যে এধরনের অত্যাচার করলে দেশে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আজকের লড়াইকে সফলতায় নিয়ে যেতে হ'লে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকেই এগিয়ে আসতে হ'বে সমাজতন্ত্রের বিপ্লবকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে"।

বলশেভিক পার্টির তারা দাস এবং পোর্টের সঞ্জীত ঘোষ হিন্দিতে বক্তৃতা করেন।

(৩য় কলমের পর)

কাছে থাকা সত্বেও কার্য্যরত তিন জন শিক্ষার্থীকে কোন প্রকার সন্তোষজনক কারণ না দেখাইয়াই বরখাস্ত করা হয়। ষ্টোর কিপারের উপর কিন্তু কোন প্রকার শাস্তি মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। গত ২২শে সেপ্টেম্বর আরও ৮।১০ জন শিক্ষার্থীকে বিনা কারণে বরখাস্ত করা হয়।

এই সব দুরবস্থার ও দুর্নীতির প্রতিকার 'জাতীয় সরকারের' নিকট হইতে পাওয়া যাইবে এই আশা আমরা বহুদিন পোষণ করিয়াছিলাম কিন্তু বর্ত্তমানে বুঝিতে পারিয়াছি এই 'জাতীয় সরকারের' দুর্নীতি অত্যাচার প্রভৃতি দূর করার কোন ইচ্ছাই নাই উপরন্তু বৈষম্যমূলক আচরণ এবং স্বজন প্রীতির ফলে নিরীহ শিক্ষানবিশদের উপর লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িতেই থাকিবে। তাই আপনাদের পত্রিকার মারফৎ মেহনতকারী জনসাধারণের এবং দেশের সংগ্রামী শক্তির কাছে আমাদের দুরবস্থার কথা জানাইতে চাই এবং প্রতিকারের জন্য একদিকে বিভিন্ন ট্রেণিং সেণ্টারের সহকর্ম্মীদের সংগবদ্ধ হইয়া আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি আর অন্যদিকে জনসাধারণের কাছে আবেদন করিতেছি আমাদের আন্দোলনের পিছনে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য জানাইতে।

জনৈক শিক্ষানবিশ
ক্যালকাটা ট্রেণিং সেণ্টার
১১০নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড,
গভর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
West Bengal State Committee
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

★ দানিয়ুব সমস্যায় সোবিয়েৎ নীতি ★

(দানিয়ুব সম্মেলনে ভিশিন্স্কির বক্তৃতা)

দানিয়ুব সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ পীক্ অভিযোগ করেন যে সোবিয়েৎ সরকার জার সরকারের কোন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে রাজী হন নাই। এই অভিযোগ করা হয়, ব্রেষ্টলিটোভস্ক শান্তিচুক্তি সম্পর্কে। অভিযোগের উত্তরে সোভিয়েৎ প্রতিনিধি মঃ ভিশিন্স্কি বলেন :— অক্টোবর বিপ্লবের পর হইতেই সোবিয়েৎ সরকার যুদ্ধ সম্পর্কে একটি মাত্র নির্দিষ্ট মনোভাব অবলম্বন করেন। কেরেনস্কি ও মিল্যুকভের সরকারের (ইহারা ছিলেন "বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী") ব্রিটেনের লয়েডজর্জ সরকারের এবং ফ্রান্সের ক্লেমেনশো সরকারের সহিত গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। সে গাঁটছড়া ছিল এমন যে মিল্যুকভের পররাষ্ট্রনীতির সহিত লয়েডজর্জের পররাষ্ট্রনীতির কোন তফাৎ দেখা যাইত না। তাঁহাদের ধ্বনি ছিল শেষ রুশ-সৈন্যটি পর্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বলি দিতে হইবে। সেই ধ্বনির বিরুদ্ধে অক্টোবর বিপ্লবের ধ্বনি হইল "যুদ্ধ নিপাত যাক। কাইজারের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি চলিবে না। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সহিত গোপন চুক্তি চাহি না"। জার্মানী অক্টোবর বিপ্লবের শান্তি প্রস্তাবের জবাব দিল আক্রমণ চালাইয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স উইলসনের আশ্রয়ে বসিয়া কোন জবাবই দিল না। তাহাদের আশা ছিল যুদ্ধে নবজাত সোবিয়েৎ শিশু-রাষ্ট্র রক্তক্ষরেই মারা যাইবে। কেরেনস্কি ও মিল্যুকভের সরকার ও ইহাই চাহিয়াছিলেন কারণ এক্ষেত্রে রুশ জমিদার ও ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের সহিত ব্রিটিশ ও ফরাসী ধনিকদের স্বার্থের কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তবু সোভিয়েৎ সরকার নিজস্ব নীতিবলে যুদ্ধ হইতে বাহির হইতে পারিলেন। সেজন্য অবশ্য ব্রেষ্ট চুক্তির মূল্য দিতে হইয়াছিল। এই মূল্য চুক্তির ফলে সোবিয়েৎ তবু শক্তি সংগ্রহ করিবার সময় পাইল। অবশ্য প্রতিক্রিয়ার ইহা পছন্দ হয় নাই। তাই চার্চিলের মারফৎ ১৪টি রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যদল সোবিয়েৎ আক্রমণ করিল। অবশ্য সেই অভিযান সোবিয়েৎ সরকার ব্যর্থ করে। এরূপ নাজুক অবস্থায় সোবিয়েতের কাছে জার সরকারের ঋণ পরিশোধের দাবী জানান হয়। "মিঃ পীক আপনার কি মনে নাই জেনোয়ার মিত্রপক্ষের সেই দেনা শোধ বৈঠকের কথা? সে সময়ে সোবিয়েৎ সরকার জানান যে যদি সকল প্রকার সশস্ত্র আক্রমণ বন্ধ করা হয় তাহা হইলে সোবিয়েৎ ন্যায্য দাবী মিটাইতে রাজী আছে। এবং সোবিয়েৎ সরকারকে সেই সঙ্গে বৈধ-সরকার বলিয়া মানিয়া লওয়া চাই। সোবিয়েৎ সরকারের এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়াই জেনোয়া বৈঠক ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি মহাশয় অযথা সত্যঘটনা বিকৃত করিতেছেন।"

১৯২১ সালের দানিয়ুব চুক্তির আসল রূপ

"মিঃ পীক আপনি বলিয়াছেন যে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ১৯২১ সালের দানিয়ুব বৈঠকের চুক্তিতে পরে যোগ দিতে চাই নাই কেন। একথা আপনার মনে থাকা উচিৎ যে ১৯০৪ সালে সোবিয়েৎ দানিয়ুব কমিশনে প্রবেশের জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও রুমানিয়ার অনুমতি চাহিয়াছিল। ব্রিটেন সেই অনুরোধের প্রকৃতপক্ষে কোন সঠিক জবাব দেয় নাই। ফ্রান্স ও তাই। রুমানিয়ার দানিয়ুব কমিশন ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী ন্যায্যই ছিল কারণ কমিশন দানিয়ুবীয় রাষ্ট্র গুলির অধিকার অপহৃত করিয়াছিল। জার্মানীর কমিশনে প্রবেশের চেষ্টাকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমর্থন করিয়া সফল করে ১৯৩৯ সালে, যখন হিটলারের রাজত্ব চলিতেছিল। কিন্তু সোবিয়েতের জন্য তখন যায়গা পাওয়া গেল না। আপনি যদি "অধিকার প্রতিষ্ঠার" কথা বলেন তো আসলে রুশিয়া ১৮৫৬ ও ১৮৭৮ সালে দানিয়ুব জলপথে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু তবু ১৯২১ সালে রুশিয়ার কৃষক মজুর রাজ হইয়াছে বলিয়া তাহাকে তাহার প্রতিষ্ঠিত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। সুতরাং সোবিয়েৎ দানিয়ুব কমিশনে প্রবেশ করিতে চায় নাই একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

দানিয়ুব সমস্যার তাৎপর্য্য

১৯৪৬ সালে প্যারীর শান্তি বৈঠকে সকলে একমত হন যে দানিয়ুব সমস্যা লইয়া একটি স্বতন্ত্র বৈঠক হইবে এবং সেই বৈঠকে প্রধানতঃ সেই সবরাষ্ট্র যোগ দিবে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে দানিয়ুবের সহিত জড়িত। ইহা ছাড়াও আমেরিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্স বৃহৎ শক্তি হিসাবে যোগ দিবে।

১৯২১ সালের চুক্তির সহিত বর্তমান প্রস্তাবিত চুক্তির খসড়ার পার্থক্য কি? ১৯২১ সালের ব্যবস্থায় অ-দানিয়ুবীয় রাষ্ট্রেরা দানিয়ুবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। "সকলের সমান সুযোগের" যে ধুয়া তোলা হইয়াছে তাহার আসলরূপ আমরা যথেষ্ট দেখিয়াছি। আর সুয়েজ, পানামা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক জলপথের ক্ষেত্রেও তো তাহা খাটেনা। যাহা হউক সোবিয়েতের মতে দানিয়ুবীয় রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ ও সার্বভৌম অধিকার বজায় রাখিয়া দানিয়ুবে অবাধ যানবাহন চলাচলের ও বানিজ্যের ব্যবস্থা হওয়া চাই যাহাতে ঐ রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ও বাহির বিশ্বের সহিত বানিজ্যগত ও সংস্কৃতিগত বন্ধন দৃঢ় হয়। এই ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের প্যারী বৈঠকে বৃহৎ চতুঃশক্তি একমত হন যে ভবিষ্যৎ দানিয়ুব চুক্তিতে প্রত্যেক দেশের নাগরিক বাণিজ্যপোত ও পণ্যদ্রব্যের দানিয়ুব জলপথে যাতায়াতের সমান অধিকার থাকিবে এবং জলপথের মাশুল আদায়ের ও বন্দর ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

দানিয়ুব বলিতে আমরা আসল দানিয়ুব নদীই বুঝিব। তাহার উপনদী বা শাখানদী বা খাল নয় (১৯২১ সালে সবগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু ১৮৫৬ সালে শুধু দানিয়ুবকে ধরা হইয়াছিল)। ১৯২১ সালে দানিয়ুবের জন্য দুইটি কমিশন গঠিত হয়, ইউরোপীয় (বাণিজ্যিক) দানিয়ুব কমিশন এবং আন্তর্জাতিক দানিয়ুব কমিশন। আমাদের প্রস্তাবে একটি মাত্র কমিশনের প্রস্তাব করা হইয়াছে যাহাতে শুধু দানুবীয় দেশগুলির প্রতিনিধিরা থাকিতে পারিবেন। আমরা মনে করি দানিয়ুব নিয়ন্ত্রণের এক মাত্র অধিকারী হইতে পারে দানিয়ুবীয় রাষ্ট্রগুলি। কোন অদানিয়ুবীয় রাষ্ট্রের রণপোত দানিয়ুবে চলিতে পারিবেনা এবং কোন দানিয়ুবীয় রাষ্ট্রের রণপোত যদি সেই রাষ্ট্রের সীমার বাহিরে যাইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সম্মতি লইতে হইবে। ইহাই হইল মোটামুটি কথা। (টাস)

ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের বিক্ষোভ

পূজা বোনাস ও ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন

বি-পি-টি-ইউ-সির ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত

ইঞ্জিনিয়ারীং শ্রমিক ফেডারেশনের (বি-পি-টি-ইউ-সি) কাউন্সিল বৈঠকে এক প্রস্তাবে স্থির হয়, যে পূজা বোনাস ও অন্যান্য দাবী দাওয়া মালিকের কাছে পেশ করিবার জন্য আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকেরা বেলা ১০ টা হইতে ১১ টা পর্যন্ত ১ঘণ্টা কাজ বন্ধ রাখিবে।

এই ধর্মঘট সংগ্রামের মহড়া হিসাবে করা হইবে এবং এই মহড়া সংগ্রামে প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিক অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

গত বৎসর অনেক কারখানাতেই পূজা বোনাস দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু এবার বিভিন্ন কারখানার মালিকেরা পূজা বোনাস দিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং কোথাও কোথাও এই দাবীটি পুনরায় টাইব্যুনালে দিতে চাহিতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শ্রমিকদের মনে অসন্তোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; ভারতীয়া, বার্ণ, গোয়েঙ্কায় মেরিয়েবল্ কাষ্টিংস প্রভৃতি কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ ইতিমধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। (২৮শে সেপ্টেম্বর)

ভারতীয়া ষ্টীল কোম্পানীর শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট পুলিশের লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চালনা

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল কোম্পানীর শ্রমিকেরা ১৯৪৭ সালের পূজা বোনাস ও ছাটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবীতে একদিন কাজ বন্ধ রাখে। প্রতিবৎসরই মালিক শ্রমিকদের এই বোনাস দেয় এবং এই বৎসরের বোনাস দিতেও স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু গত তিন মাস যাবৎ শ্রমিকেরা এই দাবী করা সত্ত্বেও মালিক পক্ষ নিরব রহিয়াছে। ছাটাই শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়নের নেতা মানিক মিস্ত্রি ও (Foundry) আছে। শ্রমিকদের ক্রমাগত চাপের ফলে কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের সময় নিয়াছিল কিন্তু তাহার পরও তিন সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে, অথচ দাবী মেটান হয় নাই। কর্তৃপক্ষের এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে শ্রমিকেরা চূড়ান্ত ভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং গত ২৭শে তারিখে কাজ বন্ধ রাখে। কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয় এবং বেলা ১২টায় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়; ৩টার সময় শ্রমিকদের সতর্ক না করিয়াই হঠাৎ পুলিশ লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চালায়। লাঠি ও টিয়ার গ্যাসে ৫০ জন শ্রমিক আহত হইয়াছে এবং ৮।১০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। (২৮শে সেপ্টেম্বর)

★ চটকল ট্রাইব্যুনালের সালিশী ★

৩০০,০০০ লক্ষ সংগঠিত মজুরের বাঁচিবার অধিকার অস্বীকৃত

কংগ্রেসী সরকারের মজুর দরদের আর এক দফা নমুনা

———):০:(———

এক বৎসরের উপর মামলা চলিবার পর, বহু টালবাহানা করিয়া গত ২৪শে সেপ্টেম্বর চটকল ট্রাইব্যুনালের রায় বাহির হইয়াছে।

রায়ে মালিকদের সুপারিশগুলি বজায় রাখা হইয়াছে। মালিকদের স্বার্থে যাহাতে বিন্দুমাত্র আঘাত না পরে, তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, কিন্তু চটকল শ্রমিকেরা যে ন্যায্য নিম্নতম দাবীগুলি পেশ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। অথচ এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের জন্যই কর্তৃপক্ষ ও তার দালালেরা শ্রমিকদের ধৈর্য্য ধরিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

ট্রাইব্যুনালে শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন ধার্য্য করা হইয়াছে ২৬৲ টাকা আর মাগ্‌গীভাতা ৩২৷৷ টাকা শ্রমিকদের মূল দাবী ছিল নিম্নতম বেতন ৪০৲ টাকা ও মাগগীভাতা ৪৫৲ টাকা। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মালিকরাও নিম্নতম বেতন ২৬৲ টাকা সুপারিশ করিয়াছিল।

ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনরায় কাজে বহাল করা, যে সমস্ত শ্রমিকদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল কোন রায়ই দেন নাই।

মালিকেরা শ্রমিকদের গ্রেড্ প্রথা ও তিনমাসের বোনাস সম্পর্কে আপত্তি করিয়াছিল। তাহাদের সেই আপত্তিই মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

কোন কারণে মিল বন্ধ থাকিলে শ্রমিকেরা তাহাদের মূল মাহিনার শতকরা ৫০ ভাগ পাইবে।

কেরাণীদের নিম্নতম মাহিনা গ্রেড্ ২—৫৫৲ গ্রেড্ ১—৭০৲ করা হইয়াছে। তাহাদের দাবী ছিল নিম্নতম মাহিনা ৮০৲।

শ্রমিকদের ছুটী :—

বিনা বেতনে— ১৫ দিন
কেজ্যুয়াল লিভ—১০ দিন (বেতনসহ)
সিক লীভ— ১৫ দিন (অর্দ্ধেক বেতন)

শ্রমিকদের দাবী ছিল :—
কেজ্যুয়াল লীভ—১৫ দিন
সীক লীভ— ১৫ দিন (বেতন সহ)
সিক লীভ— ১৫ দিন (অর্দ্ধেক বেতন)

শ্রমিকদের জন্য উন্নতধরণের বাসা নির্ম্মাণ সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের রায়ে কোন কথাই নাই। চটকল শিল্প জাতীয় করণের প্রশ্ন যথেষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই বলিয়া পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। যে কোন সময়ে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার পূর্ণ অধিকার মালিকদের দেওয়া হইয়াছে।

চটকল শ্রমিকদের নিম্নতম দাবী

সম্প্রতি বি-পি-টি-ইউ-সির চটকল শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলনে চটকল শ্রমিকদের মূল দাবী নিম্নলিখিত হারে গৃহিত হয়।

নিম্নতম মাহিনা—৪০৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা—৪৫৲ ঘরভাড়া— ১০৲ বোনাস—৩মাসের মাহিনা

শিল্প জাতীয়করণ, ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ, কেরাণীদের নিম্নতম বেতন ৮০৲। উন্নত ধরণের বাসা নির্ম্মাণ।

ট্রাইব্যুনালের হার ইহার চেয়ে কম হইলে সারা বাংলার চটকল শ্রমিক আন্দোলন সুরু করিবে বলিয়া প্রতিনিধিরা সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করেন। সুতাকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইব্যুনালের রায় দেখিয়া চটকল শ্রমিকেরাও ট্রাইব্যুনালের উপর বিশেষ ভরসা করেন নাই; তাহারা পরিষ্কার বুঝিয়াছেন ট্রাইব্যুনাল একটা ধোঁকাবাজী ছাড়া কিছুই নহে, তাই শ্রমিকেরা মূল দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন সুরু করিতে প্রস্তুত এবং বিভিন্ন চটকলে ইতিমধ্যে আন্দোলনের প্রস্তুতি সুরু হইয়া গিয়াছে।

(৪র্থ কলমের পর)

কমরেড্ কৃষ্ণবীরেন গোস্বামীকে কোন রেশনিং অফিসের সিকি মাইলের মধ্যে যাইতে নিষেধ করিয়া পুলিশ কমিশনার এক সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর টাউনহল হইতে আর একজন কর্ম্মচারী অজিত ঘোষকে ছাঁটাই করা হয় এবং নোটিশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে চেয়ার হইতে উঠাইয়া লইয়া হলের বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া আসা হয়। প্রকাশ, উল্টাডাঙ্গা গুদাম হইতেও দুইজন ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। রেশনিং কর্ম্মচারীরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

★ কংগ্রেসী সরকারের রেশনিং ★

কর্ম্মচারীদের উপর জুলুম

বাছিয়া বাছিয়া ইউনিয়ন কর্ম্মীদের ছাঁটাই

———):০:(———

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কংগ্রেসী সরকারের দমণনীতি অন্যান্য শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ন্যায় রেশনিং কর্ম্মচারীদের উপরও নামিয়া আসিয়াছে; কর্ম্মচারীদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ইউনিয়ন গঠিত হইবার পর হইতেই সরকার ইহার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে। ইউনিয়ন সংগঠক ও নেতাদের বাছিয়া বাছিয়া বিনা কারণে ছাঁটাই করা সুরু হইয়াছে।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হঠাৎ রেশনিং অফিস গুলিতে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং টাউনহল সেণ্ট্রাল রেশনিং অফিসে হঠাৎ ১৩ জন কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়। তাদের মধ্যে আছেন, টাউনহল ব্রাঞ্চের রেশনিং এম্প্লয়িজ এসোশিয়েশণের সেক্রেটারী কমরেড কালী চৌধুরী। তাঁদের বলা হয় যে, যেহেতু তাঁহাদের আর প্রয়োজন নাই, সেই হেতু ছাঁটাইয়ের দিন হইতে একমাসের বেতন দিয়া তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হইল। বলাবাহুল্য ইহারা এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট কর্ম্মী। রেশনিং এম্প্লয়িজ্ এসোসিয়েশন এই সম্পর্কে একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—

কলিকাতার এবং শিল্পাঞ্চল গুলির রেশনিং কর্ম্মচারীরা বহুদিন যাবৎ তাঁহাদের ন্যূনতমদাবী লইয়া বহুবার পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন। কিন্তু সরকার এখন তাহা অস্বীকার করিয়া ইউনিয়ন ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন। গত বৃহস্পতিবার টাউনহল অফিস একপ্রকার পুলিশের হাতেই ছাড়িয়া দেন। বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়া রেশনিং কর্ম্মচারীদের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইতেছিল। ইহা ব্যতীত কিছু বিশিষ্ট কর্ম্মীদের উপর নামিয়া আসে বরখাস্তের নোটিশ। ইঁহাদের মধ্যে আছেন, সভাপতি মুকুল গুহ, টাউনহল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী কালী চৌধুরী। খবর ছড়াইয়া যাওয়ায় কর্ম্মচারীরা কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। এসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী

(২য় কলমে দেখুন)

চটকল মজদুর আন্দোলনে মালিকের মনে ত্রাসের সঞ্চার

সুরযমল নাগরমলের হনুমান জুট মিলে শ্রমিকের উপর অত্যাচার

গুণ্ডাবাজীর হুমকিতে প্রগতিশীল মজুর আন্দোলন ধংসের চেষ্টা

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

হাওড়ার হনুমান জুটমিলে কিছুদিন যাবৎ মালিকের তরফ হইতে শ্রমিকের উপর বর্ব্বোরোচিত অত্যাচার চলিতেছে, কথায় কথায় শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইতেছে, কোন শ্রমিক ছুটি লইয়া দেশে যাইলে ফিরিয়া আসিয়া দেখে চাকুরি হইতে বিনা নোটিশে বরখাস্ত হইয়াছে। সর্দ্দারদের দ্বারা মজুরেরা প্রতিনিয়তই প্রহৃত হইতেছে। গুণ্ডাবাজীর হুমকিতে প্রগতিশীল মজুর আন্দোলন ধ্বংস করিবার চেষ্টা চলিতেছে, ট্রেড ইউনিয়ণ কর্ম্মীরা যাহাতে শ্রমিকদের সাথে মেলামেশা না করিতে পারে তাহার জন্য শ্রমিক বস্তিতে বস্তিতে দারোয়ান পাহারা বসান হইয়াছে। এই সব অত্যাচারের ফলে শ্রমিকদের মনে তীব্র অসন্তোষ জমিয়া উঠিতেছে।

চটকল শ্রমিকদের উপর মালিক শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের হাওড়া জেলার ঘুষুরি ইউনিটের উদ্যোগে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় কর্ম্মী ও সমর্থকদের এক সভা হয়; সভায় শ্রমিক নেতা কমরেড রাধাশ্যাম সাহা উপস্থিত ছিলেন। সুরযমল নাগরমলের হনুমান জুটমিল ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জুটমিলে কিছুদিন যাবত মালিক শ্রেণী গুণ্ডা ও দালালের সাহায্যে শ্রমিক শ্রেণীর উপর যে অত্যাচার সুরু করিয়াছে এবং রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীদের উপর যে হামলা সুরু করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে কি ভাবে লড়াই চালানো যায় সে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক আর্ট প্রেস, ২০ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—কার্য্যালয় : ১-এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১৭